মালদা শহর থেকে প্রায় ১৭ কিমি উত্তরে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে পৌঁছান যায় পান্ডুয়ায় যার বুকে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রথম রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। গবেষকদের মতে মুসলিম যুগের পূর্বেও এখানে হিন্দুরাজবংশের রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলি শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-৫৮ খৃস্টাব্দ) বাংলার সুলতানি যুগের সূচনা করেন পান্ডুয়াতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে নির্মিত আদিনা মসজিদ (নির্মাণকাল ১৩৬৪-১৩৭৪ খৃষ্টাব্দ) বাংলার ইসলামিক স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। আয়তনে

আদিনা মসজিদ - অভ্যন্তরভাগ

সম্ভবত বিশ্বে তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রধানত ইটের তৈরী এই মসজিদটির দৈর্ঘ ১৭৩.৩৮ মিটার এবং প্রস্থ ৮৬.৮৬ মিটার। মূল উপাসনাস্থলটির দুইধারে পাঁচটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে, এই কক্ষটির ছাদ এখন বিনষ্ট। এর মধ্যভাগে একটি কারুকার্য সমন্বিত মেহ্‌রাব যার বামপার্শ্বে আছে প্রার্থনা পরিচালনার জন্য বেদি। ডানদিকে মাটি থেকে কিছু উপরে বাদশা-কা-তখত। এর কাঠের মেঝেটি পরবর্তী সংযোজন। যদিও সাধারণভাবে এটিকে শাসকের উপাসনার স্থান বলে মনে করা হয় কিন্তু এর প্রকৃত ব্যবহার বোধ হয় নারীদের উপাসনার আলাদা স্থানরূপে। পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি উপাসনার কুলঙ্গি কারুকার্যমন্ডিত এবং এদের গায়ে খোদিত লিপি ঈশ্বরের গুণকীর্তন করছে। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল সিকান্দার শাহের সমাধিকক্ষ। ছাদবিহীন বর্গাকার এই স্থানটির আয়তন ১২.৬৫ মিটার। সমাধির কোন চিহ্ন অবশ্য এখন লুপ্ত। ব্যাপ্তি এবং পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে আদিনা মসজিদ বাংলার ইসলামিক স্থাপত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কুতবী পরিবারের কোন সদস্য কর্তৃক নির্মিত (১৫৮২ খৃষ্টাব্দ) কুতবশাহী মসজিদটি নূর কুতবুল আলমের সমাধি এবং একলাখি সমাধিসৌধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর নির্মাণে ইট এবং পাথরের ব্যবহার দেখা যায়।

কুতবশাহী মসজিদ

পীর নূর কুতবুল আলমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্মিত বর্তমানে ছাদহীন এই সৌধটিতে দশটি গম্বুজ ছিল। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে পাঁচটি মেহ্‌রাব আছে।

কুতবশাহী মসজিদের উত্তরপূর্বে অল্প দূরে একলাখি সমাধি সৌধ অবস্থিত। আনুমানিক ১৪১২-১৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই সৌধটির সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত যে এর নির্মাণে একলাখ টাকা খরচ হয়েছিল তাই এ নাম। অপূর্ব কারুকার্য মন্ডিত ইটের তৈরী এই সৌধটির অভ্যন্তরে তিনটি কবর দেখা যায় যথাক্রমে সুলতান জালালুদ্দীন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের। যদিও এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

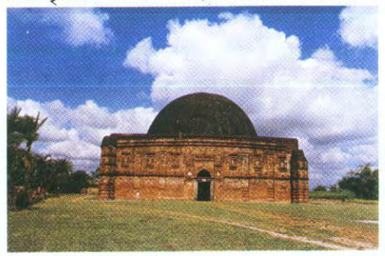

একলাখি সমাধি সৌধ

মালদহ

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত মন্দির ও অন্যান্য পুরাকীর্তি

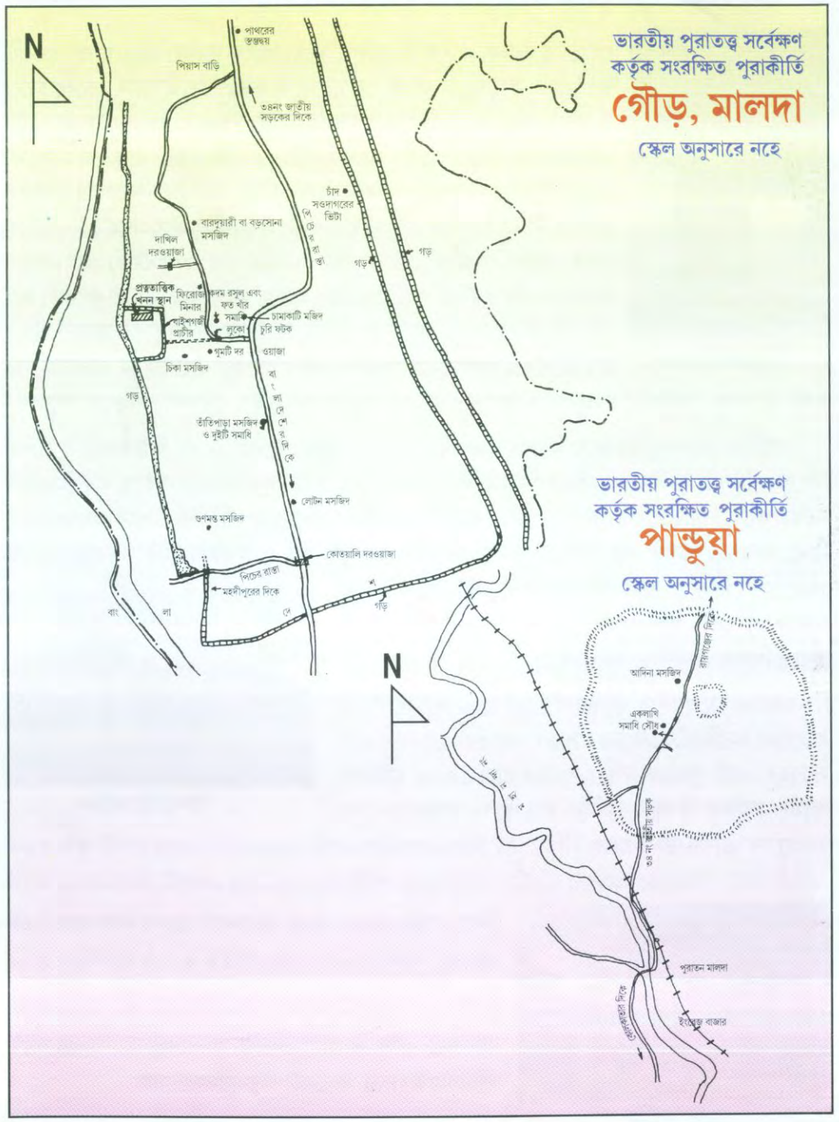

প্রত্নকীর্তিমপাবৃণু

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

মালদহ

গৌড় ও পান্ডুয়ার পুরাকীর্তি

অলংকৃত মেহ্‌রাব-আদিনা মসজিদ

প্রত্নকীর্তিমপাবৃণু

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

গৌড় ও পান্ডুয়া

মালদা নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার প্রধান শহরটি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর কলকাতা থেকে ৩৩৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। রেলপথেও সহরটি কলকাতার সঙ্গে যুক্ত। শিয়ালদহ (কলকাতা) স্টেশন থেকে এর দূরত্ব হল ৩৪৯ কিলোমিটার। মালদার সন্নিকটবর্তী ঐ জেলার অন্তবর্তী গৌড় (অক্ষাংশ ২৪°৫১′ দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১০′) ও পান্ডুয়া (অক্ষাংশ ২৫°০৮′ দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১২′) স্থান দুটি বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত সৌধরাজির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ।

দাখিল দরওয়াজা

প্রখ্যাত গ্রন্থকার পাণিনির ব্যাকরণে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড় নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। একসময় গৌড় একটি জনপদ হিসাবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের (আনুমানিক ৬০৬-৬৪৮ খৃস্টাব্দ) প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের (আনুমানিক ৬০৩-৬৩৮ খৃস্টাব্দ) আমল থেকে। বাংলার পাল ও সেনরাজাদের অধীনে অষ্টম হইতে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌড়ের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরে মুসলমান আধিপত্যকালেও এখানকার অনেক সুলতান গৌড়ের অধিপতি রূপে পরিচিত ছিলেন। এই মুসলমান শাসনকালের বহু নিদর্শন সমৃদ্ধ বর্তমান গৌড় গঙ্গার এক মজে যাওয়া খাতের উপর অবস্থিত। বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর বাদশাহ হুমায়ুন (১৫০৩-৫৬ খৃস্টাব্দ) গৌড় নগরীকে জিন্নতাবাদ অর্থাৎ স্বর্গ সমতূল্য বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে শেরশাহের দ্বারা লুণ্ঠিত এবং বিধ্বস্ত হবার পর শহরটির বহুদিনের গৌরবের অবসান ঘটে।

গুমটি দরওয়াজা

লুকোচুরি ফটক

গৌড়ের ৩২কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পান্ডুয়া একটি অনুরূপ প্রত্নস্থল। কিংবদন্তী মতে মহাভারতের প্রখ্যাত পান্ডুরাজবংশের স্মৃতি বিজড়িত পান্ডুয়া (পান্ডুনগর) অথবা পারুয়া অন্যথায় ফিরুজাবাদ নামে অভিহিত স্থানটি মুসলমান শাসনাধীনে কিছুকালের জন্য বাংলার রাজধানী রূপে খ্যাতিলাভ করেছিল। এখানে কয়েকটি সুন্দর ও ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত উল্লেখযোগ্য ইসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। ঐ সব নিদর্শনের অনেকগুলি কালের প্রভাবে জীর্ণ হয়ে থাকলেও এগুলি বেশ উচ্চমানের প্রযুক্তি কৌশলে সমৃদ্ধ এবং স্বমহিমায় বিরাজমান।

সুবৃহৎ গৌড় নগরীর চতুস্পার্শ্বে ছিল চওড়া মাটির প্রাচীর। এই মাটির বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ছিল ইটের প্রশস্ত সুরক্ষা প্রাচীর, বহু মসজিদ, মাজার বা সমাধিসৌধ, সুউচ্চ স্তম্ভ এবং সৌধ ও অট্টালিকা, এখানকার স্থাপত্যকীর্তি সমূহের সবকটিই ইটে তৈরী, তাতে কোথাও কোথাও আছে পোড়ামাটির অলঙ্করণ। এই সব স্থাপত্যের প্রাচীরের গায় পাথরের আস্তর বা আবরণেরও ব্যবহার দেখা যায়।

এই সৌধগুলিতে পন্ডিতেরা বাংলার স্থাপত্যরীতির উপর মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও অলঙ্করণ প্রভাবের সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন। বঙ্গীয় স্থাপত্যধারার ঐ সকল সৌধ ও ইমারৎগুলির প্রামান্য শিলালিপিগুলি অধিকাংশই বর্ত্তমানে বিনষ্ট কিংবা নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে সৌধগুলির নির্মানকাল ও প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে বিতর্কের অবসান হয়নি।

ফিরোজ মিনার

গৌড়ের ফটক ও তোরণগুলির মধ্যে আছে দাখিল দরওয়াজা, গুমটি দরওয়াজা, লুকোচুরি ফটক, কোতোয়ালি দরওয়াজা ইত্যাদি, যাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল রাজকীয় দুর্গের উত্তরে অবস্থিত দাখিল দরওয়াজা। এটি ছিল নগরের প্রধান প্রবেশ তোরণ এবং এর আরেকটি নাম হল সালামী দরওয়াজা। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে কোন উৎসবের স্মারকহিসাবে ফটকটি নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে রুক্নুদ্দীন বারবকশাহ (আনুমানিক ১৪৫৯-১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ), হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃস্টাব্দ) এবং নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খৃস্টাব্দে) এর অনেক সংস্কার ও উন্নতি করেন। এই ফটকটি লম্বায় ৩৫ মিটার। এর ভিতরের প্রশস্ত যাতায়াতের রাস্তার উপর রয়েছে একটি ধনুকাকৃতি খিলানের ছাদ। এছাড়াও রয়েছে দুই পার্শ্ববর্তী দুটি রক্ষী-প্রকোষ্ঠ। ফটকের চারকোণে দ্বাদশকোণী বুরুজগুলি ফটকটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

গৌড়ের সৌধসমূহের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হল ২৬ মিটার উচ্চতা ও ১৯ মিটার পরিধি বিশিষ্ট ফিরোজ মিনার বা ফিরোজা মিনার নামে পরিচিত কীর্তি চিহ্নটি। দুর্গপরিধির বাইরে এই মিনারটি দাখিল দরওয়াজার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। মৃত্তিকায় প্রোথিত দ্বাদশকোণ ভিত্তির উপরে পঞ্চতল এই মিনারের প্রথম তিনটি তল বহুকোণ বিশিষ্ট এবং উপরের দুটি তল গোলাকার। এর অভ্যন্তরে একটি ঘোরানো সোপান শ্রেণী উপরের তলা পর্যন্ত উঠে গেছে, যার মধ্যে ৭৩টি ধাপ আছে। এর বহিরাঙ্গের শোভা বর্ধন করছে শিকল ও ঘণ্টার অলঙ্করণ।

বারদুয়ারী মসজিদ

অন্যান্য উল্লেখনীয় স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে বারদুয়ারী বা বড়সোনা মসজিদটি গৌড়ের মসজিদ সমূহের মধ্যে আয়তনে সর্ববৃহৎ। এটি সুলতান নসরৎ শাহের দ্বারা ১৫২৬ খৃস্টাব্দে জামী মসজিদ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। আয়তক্ষেত্রের আকারের ভিত্তির উপর ইষ্টক নির্মিত এই বিশালাকায় ইমারৎটির চারকোণে রয়েছে চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ এবং বহির্ভাগে প্রস্তরের একস্তর গাঁথনি। অট্টালিকার পূর্বদিকের প্রাচীরের এগারটি খিলানাকার ফটক দিয়ে গম্বুজওয়ালা লম্বা বারান্দায় প্রবেশ করা যায়। এই বারান্দা থেকে আবার প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করা যায়। প্রার্থনা বা নামাজের এই বিস্তৃত কক্ষটির ছাদের উপরে একসময়ে যে অনেক গম্বুজ সন্নিবিষ্ট ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

লোটন মসজিদ

তাঁতিপাড়া মসজিদ থেকে কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে পড়ে লোটন বা লাটন মসজিদ। সম্ভবত সুলতান ইউসুফ শাহের দ্বারা ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে একজন নর্ত্তকীর আনুকূল্যে নির্মিত হয়েছিল। যদিও এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। মসজিদটির অভ্যন্তরে সম্মুখের দিকে একটি বারান্দা এবং পূর্বদিকে তিনটি খিলানাকার প্রবেশ পথ আছে। এই মসজিদটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর অভ্যন্তরের ও বাইরের প্রাচীরের উপর রঙবেরঙের এনামেল করা ইটের অলঙ্করণ, যার অনেকটাই বর্তমানে লুপ্ত হলেও এর অতীত সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। গৌড়ের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল তাঁতীপাড়া মসজিদ, গুণমন্ত মসজিদ, চিকা মসজিদ, চামকাটি মসজিদ ইত্যাদি।

বাইশগজী প্রাচীর

চতুস্পার্শ্বস্থ মাটির প্রাচীরের অভ্যন্তরে গৌড়ের প্রশস্ত একটি ইস্টক নির্মিত সুরক্ষা প্রাচীর লক্ষিত হয়। কদম রসুলের পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রাচীরের নাম বাইশগজী দেওয়াল। দেওয়ালটি উচ্চতায় বাংলায় প্রচলিত মানে বাইশগজ (১৬.০২ মিটার) এবং সেই জন্যই এই নাম। সম্ভবত সুলতান বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃস্টাব্দ) তাঁর প্রাসাদকে সুরক্ষিত করবার জন্য এই প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। ক্রমহ্রাসমান ভাবে নির্মিত এর নিম্নাংশ ৪.৬৫ মিটার এবং সবোচ্চ স্তরে ২.৮০ মিটার চওড়া।

কদমরসুলের প্রাঙ্গনে সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ইষ্টকের উপর পঙ্খপ্রলেপের আস্তরণযুক্ত আয়তাকার ক্ষুদ্র একটি সমাধি সৌধ আছে। ফতখাঁর সমাধি নামে পরিচিত এই সৌধটি গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখনীয়। এর উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে আছে একটি করে কড়ি খিলানের প্রবেশ দ্বার এবং উপরে একটি মাত্র খোদাই করা পৃষ্ঠদণ্ডের দুইদিকে প্রলম্বিত ঢালু দোচালা ছাদ। এই ধরণের ঢালু ছাদ সম্বলিত ইমারৎ বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কীর্তি। প্রাকমুসলমান আমলে নির্মিত স্থাপত্যের নিদর্শন গৌড়ে খুবই কম। কিন্তু প্রচলিত কয়েকটি নাম প্রাক্তন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলির মধ্যে চাঁদ সওদাগরের ভিটা, ছোটসাগর দিঘি, পিয়াসবাড়ী দিঘি, বড়সাগর দিঘি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সন্নিকটবর্তী বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র রামকেলী ছাড়াও আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নিদর্শন গৌড় ও তাৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

ফতখাঁর সমাধি

মেহরাব এবং খিলানযুক্ত দেওয়াল-আদিনা মসজিদ

গৌড়ের প্রাচীন নিদর্শনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংযোজন হল বাইশগজী প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় খনন কার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত এক বিরাট ইটের তৈরী বাড়ি ঘরের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের মতে এই স্থানটিতে গৌড়ের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। যদিও এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়নি তথাপি সুলতানি শাসনকালের নির্মাণশৈলীর কিছু অন্য ধরণের নিদর্শনের নমুনা হিসাবে এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ।